আঁধারের অনেক তরমুজ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্পষ্টই মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে ভারততত্ত্ব সংক্রান্ত একটি আলোচনাচক্রে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের 'দেবী' (১৯৭০) থেকে ভাষ্যসমেত কিছু অংশ পড়ে শোনালে শ্রোতাদের মধ্যে দু-রকম আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। কোনো কোনো বিদগ্ধ বন্ধু এ-বইয়ের মধ্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপুরাণের একটি নিবিড় ব্যক্তিগত রূপান্তর লক্ষ করেছিলেন। তাঁদের ধারণায়, পার্থপ্রতিমের কবিতায় আধুনিক মনের উপযোগী স্বগত ভক্তিবাদ ব্যক্ত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকজন সতীর্থ ওই কাব্যগ্রন্থে আদৌ কোনো ঐশিতা শনাক্ত করেননি। তাঁদের বিবেচনায় চণ্ডীপুরাণকে কবি পার্থিব সংরাগের প্রয়োজনেই কাজে লাগিয়েছেন।

আসলে কবিতায় তো ঐহিকতা এবং ঐশ্বরিকতা বিভাজিত হয়ে থাকতে পারে না। পার্থপ্রতিম সেই বৈপ্লবিক সত্তার শিল্পী যিনি মানুষের স্বভাবের প্রচলিত শিবিরগুলিকে তছনছ করে দিতে জানেন। তাঁর কবিতা যখনই পড়ি, পায়ের তলা থেকে প্রাত্যহিকের মৃত্তিকা সরে যায়, বেরিয়ে আসে 'জলে ভেজা পিলার', 'পিচ্ছিলচঞ্চল' সেই আশ্রয় ছা-পোষা মানুষের কাম্য হতে পারে না। পার্থপ্রতিম মধ্যচিত্ত মানুষের সেই অনাশ্রয়িতার সুযোগ নিয়ে নানারকমের জলপরিসর তৈরি করতে থাকেন, কখনো আমাদের নির্মোহচিত্তে দেখান, 'দিহিতে কচুরিপানা দৃঢ় সংগঠনে/প্রবল জটিল', কখনো-বা অনুভব করান, 'অন্তরে সাগর পাতা'। কবি কিন্তু তদ্‌গত চিত্তে জানেন, জল কোনো অর্থেই বিপজ্জনক নয়, বরং তার মুখে লেগে আছে এক ধরনের আত্মিক চ্যালেঞ্জ কিংবা প্রতিশ্রুতি। তাই তাঁর মনোনীত ড্রাইভার দেখতে পান, 'পুকুরে তারার ছায়া'।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, শুধু জল নয়, মাটি এবং পঞ্চভূতের অপরাপর পরামর্শ তাঁকে ঘিরে উন্মথিত হয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতেই 'হয়তো পুরাণপ্রিয় এই মন বন্য কালীকে দেখল।' এই অসামান্য উচ্চারণের পর আমরা তাঁর কবিতায় শাক্ত সমর্পণের আর্তি খুঁজতে গেলে যে বিভ্রান্ত হব, সেটা তো জানা কথা। পার্থপ্রতিম ততক্ষণে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বৈতায়ন বরবাদ করে দিয়ে নির্বেদের আস্বাদ নিতে গিয়ে আমাদের কাছে থেকেও দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। 'নির্ণয়েচ্ছু সেই পলায়ন ।'

হাতেনাতে তাঁর অভিপ্রায় ধরতে পারব, এই দুরাশা নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়তে চাই তাঁর 'রাত্রি চতুর্দশী' (১৯৯৯) এবং 'টেবিল, দূরের সন্ধ্যা' (বাংলায় প্রদত্ত সাল: ১৯৩০)। খুবই স্বল্পায়ত দুটি বই, উপরন্তু সম্পূরক দুই মলাটে আবদ্ধ। তাই প্রথম প্রথম মনে হয়, এবার বুঝি নিছক ঋজুরৈখিকতার যুক্তিতে, তাঁর মতিগতির কিনারা পেয়ে যাব। কিন্তু অচিরেই ঠেকে শিখতে হয়, কবিতার বাইরে কোনো চাবিকাঠি পাঠকের হাতে গুঁজে

দেওয়া কবির এষণা নয়। শুরু থেকেই সরাসরি পাঠককে ডেকে নেন কবিতার অন্যনিরপেক্ষ তিমিরাভিসারে। পাঠক হয়তো তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগেই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দান্তে কি কমলকুমার, ফ্রয়েড কিংবা ইয়ুংকে। কিন্তু ওই মনস্বী নক্ষত্রেরা তাঁকে উসকে দিয়েও তেমন কোনো সহায়তা করে না। বৃত্তের সূচনা থেকেই হাতছানি দেয় বিরোধাভাসের দ্যুতিবিদ্ধ, স্বকীয়তায় মণ্ডিত, চিত্রকল্প: 'আমার ঘুমের ফুটপাতের শনিরা/অপরাজিতার ধ্রুব উপমায় রাখা', 'ট্রেনের সতত/শৈলজল, অগ্নিশব্দ', 'লঘু জল মেঘ ছিল আচমনোন্মুখ।' বস্তুত আধ্যাত্মিক এই সমস্ত সম্ভার ঠেলে পরের বইতে নির্ধারিতভাবে কিছু সূত্র উদ্‌ঘাটন করব, এরকম উচ্চাশাকে শান্তি দিয়ে আশা-নিরাশার অতিশায়ী কবিতাছবি আমাদের অকাতরে উপহার দিতে থাকেন পার্থপ্রতিম:

১

সে রয়েছে পশ্চিমবাংলায়
যেখানে পল্লব নেই, শুধু আত্মহত্যার রাঙা, রাঙা ভয় আছে

২

যমুনার ধারে ধারে ফ'লে আছে আঁধারের অনেক তরমুজ

গ্রামবাংলার ভিতর দিয়ে চলেছি, লোকসংস্কৃতির অসংখ্য অনুষঙ্গ করায়ত্ত হয়ে এসেছে, এমন ধারণার বশবর্তিতায় যখন সর্বশেষ কবিতায় পৌঁছে যাই, সেখানে আমরা কাফকার মতোই আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যাই ব্যুরোক্রেসির একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে। চোখের সামনে দেখতে পাই কবি বা কর্মীকে, বিকেল পাঁচটার পর যখন তাঁর সহকর্মীরা কর্মস্থল ছেড়ে গিয়েছে, তিনি একা আরব্ধ কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেও সমাপ্তির স্বস্তি পাচ্ছেন না, দুর্মর বোধির মতো যতক্ষণ না তাঁর মনে হচ্ছে: 'চেয়ার, রাখতে হবে সামান্য সরিয়ে।' এই তো, কবিতার উপকরণ ছাড়াই সাধিত হল প্রায় নিরাকার শূন্যের উপরে অসামান্য একটি কবিতা, চেয়ারটাকে সামান্য সরিয়ে রাখবার মাধ্যমে। প্রতিপন্ন হল, পার্থপ্রতিম নখাগ্র পর্যন্ত কী পরিমাণ নাগরিক! এক বই থেকে আরেক বইতে যাবার সময় কবি নিশ্চয়ই পাঠকের হাতে অন্তত অংশত ধরা দেওয়ার কথা ভাবেন। তা যদি না হত 'পাঠকের সঙ্গে, ব্যক্তিগত' (২০০১) নামটি তিনি ধার্য করতেন না। কিন্তু প্রচ্ছদের এই সংজ্ঞায়ন প্রকৃতপক্ষে পাঠকের সঙ্গে তাঁর নিয়তিময় খেলা। পাঠক যখনই একটি কবিতায় নিজের একটি প্রস্থানভূমিকার আভাস পাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গেই পার্থপ্রতিম, হয়তো খেলাচ্ছলেই, একটি দুর্গ তুলে দেন। 'দেয়ালগিরি' কবিতাটি, উদাহরণ, আশ্চর্য রকম স্বচ্ছ, এমনকী প্রত্যক্ষও। 'আজ ঘাস দুলে উঠছে বর্ষার নিভৃতে'র মতো চরণ-এর ঐশ্বর্য, এবং পাঠক যখন কবির জারি করা অনুশাসন মেনে নিয়ে তাকে সনেট বলেই ধরে নেন, কবি এক ঝটকায় তাঁর সেই তৃপ্তি 'সনেট' ও 'সনেটের আদলে'-র অ্যাকাডেমিক পার্থক্য দেখিয়ে চূর্ণ করে দেন। এরকম দৃষ্টান্ত এ বইয়ের একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। জাপানি 'তান্‌কা' কবিতার অনুরক্ত পড়ুয়ারাই তাকে সনেটের ধরন বলে চিহ্নিত করতে যাবেন কেন? আপাতত পার্থপ্রতিমের ছন্দের

ঠাটেই দেখা যাক অনামি কবির এই কালজয়ী তান্‌কা-র পাঁচ লাইনের কাঠামো:

প্রসন্ন হয়ে দেখি
যা দেখতে চাই পুনশ্চ পিছুটানে।
শরতের কাঁটাঝোপে
কুঁড়ি যেই ফুটে আসে
তারা কি আনে না ফল?

পার্থপ্রতিমের 'অমরকন্টকরাশি' শীর্ষক অনবদ্য মিতকথনটি এইরকম:

কবিতার বই
কল্পতরুতে তুলে
কেড়ে নিল মই,
জেনে বুঝে, নাকি ভুলে
...বহু কাঁটা তরুমূলে।

এ-পর্যন্ত কোথাও কিছু বুঝে নিতে ভুল হল না; কিন্তু আবার পিছিয়ে ফিরে গিয়ে যেই বন্ধনীভুক্তিতে তাকে 'তান্‌কা সনেট-এর ধরনে' আখ্যায়িত হতে দেখলাম, খটকা লাগল বই কি! সনেট উৎসকালে চোদ্দো লাইনের সমাচার ছিল না। তার প্রবর্তনা ছিল সংগীতধর্মিতায়। কিন্তু পার্থপ্রতিম অসহায় পাঠককে কিছুক্ষণ নাকানিচোবানি খাওয়ানোর উদ্দেশ্যেই যখন এ-ধরনের বিবৃতি জ্ঞাপন করেন, ঘুণাক্ষরেও সেই অনুমিতির দিকে পাঠক কি যেতে প্রস্তুত হবেন? পূর্বোক্ত 'দেয়ালগিরি' কবিতাটি কেন তিনি একাধারে বিষ্ণু দে ও উত্তম দাশকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর এক ভক্ত পাঠকের এই প্রশ্নেরও সমাধান আমার হাতে নেই। পার্থপ্রতিমের কবিতার মার্জিনে আমার একটি অকিঞ্চিৎকর অনুযোগ এই যে পাঠককে তিনি সবসময় 'সিরিয়াসলি' নেন না। 'সে হাসে। মুচকি হাসে।'

প্রাথমিক এরকম কিছু কুয়াশাকে তাচ্ছিল্য করলে অবশ্যই আমাদের কাছে মহত্ত্বে আক্রান্ত এক কবির জগৎ উঠে আসে যার গভীরতা ও পরিধি অসামান্য। সেখানে আমরা দেখতে পাই, তাঁর সমকালের কবিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় তাঁর মর্জি নেই। এই বইয়ের বেশ কয়েকটি কবিতায় তিনি স্বকালীন কোনো-না-কোনো কবির বিশ্বকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিস্পন্দের ঠামে ঋক্ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে দৃপ্ত 'শ্রীযুক্তা কবিতা সিংহকে', কবিতার 'ঈশ্বরকে ঈভ' কবিতার বিভাবনা থেকে উঠে আসা। হুবহু একই ছন্দে, অথচ ব্যঙ্গবিস্ময়মিশ্র নিজস্ব স্বরায়ণে।

অনেকদিন ধরেই দুর্মর অভিমান হচ্ছিল, পার্থপ্রতিম কম লিখছেন। পর পর তিনটি বই পড়ে সেই ধারণা অমূলক বলে প্রতিপন্ন হল। দেখলাম, তাঁর মন কাজ করে সিংহাবলোকনে, কম্বুরেখায়। ১৯৯৭-এ লেখা কবিতা ১৯৯৫-এর আগে যখন তিনি স্থাপন করেন, নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতায় অনুধাবন করতে পারি, শুদ্ধ কবিতাই তাঁর লক্ষ্যস্থল, এবং কৃত্রিম ধারাবাহিকতায় তাঁর আসক্তি নেই। কবিতার রচনাকালগুলি পাঠ করে এটাও ধরতে পারি, একটানা কবিতা লিখে চলেছেন তিনি, পাঠকের প্রতি সম্ভ্রমবশেই তার সমস্তটা তিনি প্রকাশ করেননি। বিবেকী এই কবিকে আমি নন্দিত করি।